শান্তিনিকেতন

(দশম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা।

প্রকাশক

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই যে শান্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠ্‌চে এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কি চেয়েছিল এবং কি পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড় বড় রাজা তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা খোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়! এমন

অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর, এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্ত্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি !

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিষ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে যে ফলটি ধরে, সে এই সমস্ত জিনিষ থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্যে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চারদিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সহ্য

করতে হয় নি—এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্ত্তি ধরে আপনা আপনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য্য, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে—এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুধাগন্ধ, এমন একটি মধুসঞ্চয়। এই জন্যেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ যেমন সহজ যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কি? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারদিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্ম্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারার আবর্ত্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোট বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণগন্ধ ফুল ফল নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়—কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব্ব হয়ে থাকতে হয় না।

চারদিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্চে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্চে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্চে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, সেই নিভৃতে সেই নির্জ্জনে—সেই বনের মর্ম্মরে, সেই পাখীর কূজনে, সেই উদার আলোকে সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সঙ্গমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করচে সে আমাদের পিতামহেরা আর্য্যাবর্ত্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্ব্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ

করেছেন—এই যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো দুই ভাই-বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করচে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটীর নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করেচেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্ব্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষিপিতামহেরা এই অন্তরিক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্চে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী! পিতানোঽসি, পিতানোবোধি, নমস্তেঽস্তু—এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ

প্রচলিত নেই কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই ক'টি মাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই অত্যন্ত ছোট অথচ অত্যন্ত বড় কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্ব্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অনন্তের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—এত বড় প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিন-কার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণ দ্বারাও আজ স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্য্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

একদিকে এই পুরাতন আকাশ, পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবন-বিকাশের নিত্য নূতনতা, আর একদিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী, এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত—এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র—সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি—ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্ক-লোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করচে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করচে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে

বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্চে এই গায়ত্রী।

যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করচে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, বরেণ্যং ভর্গঃ, সেই বরণীয় তেজকে ধ্যানগম্য করে তুলচে।

এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র—কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন

এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়—হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারম্ভে কি অসহ্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের? চারদিকে তিনি কোন্ জিনিষটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না? যখন আকাশের আলো তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠেছিল—যখন তাঁর পিতৃগৃহের অতুল ঐশ্বর্য্যের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গৌরব তাঁর মনকে কোনোমতেই শান্তি দিচ্ছিল না তখন তাঁর যে কি প্রয়োজন, কি হলে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে তা তিনি নিজেই বুঝ্‌তে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অরুচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অন্বেষণ করছিল; কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভুলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মত সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা অর্চ্চনা নিয়েই ত দিন কাটিয়েছেন—তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্ম্মের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল তখন এই অভ্যস্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপৃত করে রাখবার উপকরণ ত তাঁর খুব নিকটেই ছিল!

তাঁর ভক্তিকে যে এইদিকে তিনি কখনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবী

মন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভুলতেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে সহরে গাঁদা ফুল দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশান ঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁহার চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই সকল চিরাভ্যস্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁর তৃষ্ণার জল যে এদিকে নেই তা বুঝ্‌তে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয়নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেননি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাখে কার সাধ্য! যারা নানা ক্রিয়াকর্ম্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখ্‌তে চায় তাদের নানা উপায়

আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ্য মেলে— কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের ত ঐ একটি বই আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে? তাদের সামনে কোনো রঙীন্ জিনিষ সাজিয়ে তাদের কি কোনো মতেই ভুলিয়ে রাখা যায়? নিখিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে!

কিন্তু এই অধ্যাত্ম লোকের এই বিশ্ব-লোকের মন্দিরের পথ তাঁর চারদিকে যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারিদিকে প্রচলিত ছিল, এই নির্ব্বাসনের মধ্যে থেকেই ত তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল— তাঁর আত্মা যে আশ্রয় চাচ্ছিল—সে আশ্রয় বাইরে খণ্ডতার রাজ্যে সে কোথায় খুঁজে পাবে?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখ্‌তে হবে, এই কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্যে? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোট্‌বার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে, যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে, তাকে সে আর খোঁজেই না; তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে

না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিষ বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারেনা।

মেলার দিনে ছোট ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চারদিকে —এই জন্যে মুঠো কখন্ সে ছেড়ে দেয়—তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলি সে বাইরে থেকে বাইরে দূরে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না—বাইরের যে সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেইগুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড় হয়ে ওঠে; যে মা তার সব চেয়ে আপন, তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়ামষ সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিষের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায় কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক এক জন মহাপুরুষ জন্মান যাঁরা সেই অনেকদিনকার হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিকের জন্যে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জন্যে চারদিকের কারো কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জন্যে তাঁদের কান্না কোনোমতেই থামতে চায় না। তাঁরা একমুহূর্ত্তে বুঝতে পারেন আসল জিনিষটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্চে না—সেইটিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ অথচ কেউ তার কোনো খোঁজ করচে না; জিজ্ঞাসা করলে, হয়, হেসে উড়িয়ে দিচ্চে, নয়, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আস্‌চে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য, যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজ, তাকে তিনি শক্ত করে

তুল্‌তে দেন—যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেল্‌তে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখ্‌তে পাওয়া যায়—পাছে খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্য্যটি আমরা না পাই। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মত এত সহজ আর কি আছে, তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়ে সহজ—তবু তাঁকে আমরা হারাই—সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—এই যে এইখানেই!—আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি, কই কোথায়?—এই যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই যে আত্মার আত্মায়!—যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়ই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই, এই যিনি অত্যন্তই আছেন তাঁকেই

খুঁজে পাবার জন্যে এক এক জন লোকের এত কান্নার দরকার। এই কান্না মিটিয়ে দেবার জন্যে যখনি তিনি সাড়া দেন তখনি ধরা পড়ে যান—তখনি সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এই রকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউবা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, কেউবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউবা কর্ম্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিষ তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার

করবার জন্যে এসেছিলেন যে স্বার্থত্যাগ করে, সর্ব্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেল্‌লে তবেই মুক্তি হয়, কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুন্‌তে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজ-পুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে—মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়ম পালনই ধর্ম্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডীর বাইরে অন্য জাতি, অন্য ধর্ম্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্ম্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তথন যিশু এই

অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন, যে, ধর্ম্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের অনুগত নয়—সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্ম্মসাধনা হয়, বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ, কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্যে যিশুকে মরু প্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি অন্তরের

দিকে অখণ্ডের দিকে অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি—এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসঙ্কুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চল্‌তে হয়েছে—চারিদিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্ব্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্ম্মরাজ্যে যে তিন জন মহাপুরুষ সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্ম্মকে দেশগত, জাতিগত, লোকাচারগত সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্য্যের আলোকের মত,মেঘের বারিবর্ষণের মত সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্ম্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে

যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্ত্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখ্‌তে পারে না এই কথাটি তাঁরা সর্ব্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে প্রদীপটি কারো বা ছোট হতে পারে কারো বা বড় হতে পারে—সেই প্রদীপের আলো কারো বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে কারো বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন

তাঁর চারদিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না; সেই জন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মত ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্য্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মত পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব—আর কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্য দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারদিকে এত বাধা-গ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে

এত খোঁজ খুঁজ্‌তে হয়েছে এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

এ কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না। দেশ আপনার চিরদিনের যে জিনিষটি মনের ভুলে হারিয়ে বসেছিল—তার জন্যে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কি করে! চারদিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবশ্যক যার সহজ-চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়—সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা—যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়—সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্যে একলা তাঁকে কান্না জাগিয়ে তুলতে হয়—বোধহীনতার জন্যেই চারিদিকের জনসমাজ যে সকল কৃত্রিম জিনিষ নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে অসহ্য

ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে দেশ কাঁদতে ভুলে গেছে, খোঁজবার কথা যার মনেও নেই তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা খোঁজা এই হচ্চে মহত্ত্বের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্যে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে—সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্বোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয়নি—সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল—স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল—চারদিকে যে সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল—চৈতন্য না হলে চৈতন্য আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সাম্‌নে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখীকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে' সে যেমন জান্‌তে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে—এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল,—যৎকিঞ্চজগত্যাং-জগৎ, জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন্।

তারপর থেকে তিনি নদীপর্ব্বত সমুদ্র প্রান্তরে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি

—কেননা তিনি যে সর্ব্বত্রই, আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্ব্বত্রই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত সুখ—যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস গীতগন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ!

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্চে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্চে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ

সৌন্দর্য্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেননি। এই প্রকাশের কাজে একদিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায় উৎসর্গ-করা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-একদিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী—এই দুই এখানে মিলিত হয়েছে—ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রী মন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য্য মিলিত হয়ে গেছে সেইখানেই পুণ্যতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করচি, হে শান্তি নিকেতনের অধিদেবতা, আজ উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্ব্বদা জাগিয়ে রেখে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠ্‌তে পারি! গ্রন্থের

মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তি সকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে সুযোগ যে অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলি যেন তাকে নষ্ট করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিত্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলে, যে মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া

যে একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তাহলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তাহলে আমরা দিয়েও যাব—তাহলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্ম্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্ম্মরিত হতে থাক্‌বে; এখানকার আকাশের নির্ম্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব—এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে—এখানে যে সৃষ্টিকার্য্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চল্‌চে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মত ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্ব্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাটি

চিরদিন ফিরে ফিরে আস্‌বে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে, হে আনন্দময়, তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি, হে সুন্দর, তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, হে পবিত্র, তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে; হে অন্তরের ধন তোমাকে বাহিরে পেয়েছি, হে বাহিরের ঈশ্বর তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি।

হে ভক্তের হৃদয়ানন্দ, আমরা যে তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারিনে তার একটি মাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মত হতে পারিনি। তুমি আত্মদা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজস্র দান করচ—আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্ষুকতা কিছুতেই ঘোচেনা—আমাদের কর্ম্ম, আমাদের ত্যাগ, স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য থেকে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌চে না—সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্চে না—

আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দস্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারচিনে—আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠ্‌চে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতু স্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন—আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখ্‌তে পাই—তোমারই স্বরূপকে মানুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি;—দেখি যে তাঁরা কিছু চান না কেবল আপনাকে দান করেন, সে দান মঙ্গলের উৎস থেকে আপনিই উৎসারিত হয়, আনন্দের নির্ঝর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে—তাঁদের জীবন চারিদিকে মঙ্গল লোক সৃষ্টি করতে থাকে, সেই সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি—এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই, কেবলি প্রাচুর্য্য, কেবলি পূর্ণতা—দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত

করে তখনো তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনো তাঁরা বর্ষণ করেন—তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখ্‌তে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন, হে পরম মঙ্গল পরমানন্দ, তোমাকে আমরা কাছে পাই—তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ, ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি।—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিসুধা-সরস তোমার অতি মধুর লাবণ্য যেন

আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত রং নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে তা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে—অহঙ্কারের অন্ধতা থেকে যেন এই দেবদুর্লভদৃশ্য হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণ্যসঙ্গমের তীরে নিভৃত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি—মিলন-সঙ্গীত এখনো সেখানকার সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে, সেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বেজে উঠ্‌চে—থাক্‌তে থাক্‌তে শুন্‌তে শুন্‌তে সেই সঙ্গীতে আমরাও যেন কিছু সুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর—কেননা জগতে যত সুর বাজে তার মধ্যে এই সুরই সব চেয়ে গভীর, সব চেয়ে মিষ্ট,—মিলনের আনন্দে মানুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায়

এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্চ্ছনা।

৭ই পৌষ, রাত্রি, ১৩১৬।

চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে দেয়—প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে—এমন সময় প্রত্যূষে প্রভাত এসে পূর্ব্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে যাদুকরের মত জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়—দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজন-কর্ত্তা এই মুহূর্ত্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চির-কালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্চে না প্রভাত এই কথাই বলচে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সাম্‌নে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে, কোথাও মরুপ্রান্তরে, কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড় বড় সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে,—এ সেই অতি পুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্ত্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল,—সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে

একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্য-মুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সাম্‌নে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মত এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্ত্তি—সদ্যোজাত শিশুর মতই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনি নবীন হয়ে ওঠে—এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কি? এর মানে হচ্চে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী—পুরাতনতা, জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মত আস্‌চে যাচ্চে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্চে—এ'কে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারচে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা, তারা মরীচিকার মত—জ্যোতির্ম্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে

তারা দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা—কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতি পুরাতন দিন, এ'কে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আস্‌তে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুল্‌তে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্ম্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তারপরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার

নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধূলার পর ধূলা আবর্জ্জনার পর আবর্জ্জনা কেবলি জমে উঠ্‌ত—চেষ্টার ক্ষোভে, অহঙ্কারের তাপে, কর্ম্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলি মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলি কাড়তে যাওয়া, কেবলি ধাক্কা খাওয়া, কেবলি অন্তহীন পথ, কেবলি লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জম্‌তে জম্‌তে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্বুদের মত বিদীর্ণ করে ফেল্‌ত।

এখনো দিনের বিচিত্র সঙ্গীত তার সমস্ত মুর্চ্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠেনি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্ম্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠ্‌তে থাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুর-গুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠ্‌তে চাইবে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতি-যোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জ্জন উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মত এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরে-সুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেম্‌নি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই,—সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর—নিত্যরাগিণীর মূর্ত্তিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এম্‌নি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুন্‌তে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হোক্‌না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিষটি হচ্চে শান্তম্‌। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেই জন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্ত্তিতে একটু

আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্ত্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইচে কিন্তু রোজ সকাল বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্চেন শিবম্। প্রভাতে তাঁর একটি নির্ম্মল মূর্ত্তিকে দেখ্‌তে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলি রেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে বুদ্বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলট্ পালট্ হয়ে যাক্ না তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে—কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্, অন্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম্।

সমুদ্রে ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না—তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড,

তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারে অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়—তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসেনা। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্ত্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুন্‌তে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়—চরম হচ্চেন অদ্বৈতম্। আমরা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্ন বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলেনি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্, অন্তে অদ্বৈতম্, অন্তরে অদ্বৈতম্।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুন্‌তে

পেয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্ম্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্ম্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্চে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তিনি সৃষ্টি করচেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলি একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্চে এ কথা ঠিক নয়;—জগৎকে কেউ বহন করচে না, জগৎকে কেবলি সৃষ্টি করা হচ্চে—যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্চে—সেই প্রথমের

সংস্রব কোনো মতেই ঘুচ্‌চে না—এই জন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ — বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্ব্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—আমাদের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হতে হবে —আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌছয়—প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে, আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না— আমাদের চিত্ত বারম্বার সেই মূলে ফিরে আসবে—সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে

সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনো মতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনি প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ বিভাগ ভেদ বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে

তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পার্ব্বে এত বড় শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে! কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি—সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্ব্বলতা। এই জন্যেই অহঙ্কারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগ সাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা আসে কোথা থেকে এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন? না গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্য্যন্ত যাক্

না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা—কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে—কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্তেই তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিষ কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই;—তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই

নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এই জন্যে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারম্বার পরিস্ফুট করে তুল্‌তে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মত আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্চে সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যত-দূরই যাক্ না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউয়ের মতই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু

তাকে ফিরতেই হবে—কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা পতনের দ্বারা ঘটবে—তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে :—

অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না সমস্তের মূলে যিনি আছেন, তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই জন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভাল করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য্য—খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁৎ করে, সমস্ত তার গুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্ত-মত সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামত তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখ্তে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের

রাগিণীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিন্‌তে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুল্‌তে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহুদিন সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটি প্রভাতের মত সরল, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন,—ভোগবিলাস ঐশ্বর্য্য উপকরণ খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান

থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্চে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমে কত কাজকর্ম্ম, অর্জ্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়—এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চল্‌বে না—আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছন, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা

আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বল্‌চেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলি তরঙ্গলীলা চলচে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্ম্মের বেগে সে যতদূর পর্য্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটাই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ সমুদ্রেই তার লীলা চল্‌চে—তার পরে কর্ম্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দ সমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই

হচ্চে যথার্থ জীবন—এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল—সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও! প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সকলের চেয়ে বড় হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য্য হয়ে উঠ্‌ব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি তবু বলছি এ পথ তোমার না হোক্! তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক্ যেখানে জগতের ছোট বড় সকলেই এসে মিলেছে; তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জ্জন করে তাকে সার্থক কর—যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাক্‌বে, যতই বাড়বে ততই

ত্যাগ করবে এই তোমার সাধনা হোক্‌! ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস—দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আসবে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না, এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই রকম ঘট্‌চে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আন আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে, আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না—তারি মাঝে মাঝে

ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেল্‌তে খেল্‌তে মার কাছে বারবার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম্ম সংসারের খেলা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌বে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়;—সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখ যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার,দুর্য্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে;—দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আস—তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে, অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো

না, মনে কোরো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে—আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে—একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হ'য়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে—বাঁধা পোড়ো না এর মধ্যে—ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস—জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতত্ত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখ—তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ

খুলে যাবে—সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে। জগতের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্চে—এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও—বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্ম্মকে নির্ম্মলরূপে সত্য করে তোলো!

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধূলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জান্‌তে,

দান বলে গ্রহণ করতে; এখন তুমি বল্‌তে শিখেছ, এটা পুরাণো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌চে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেন না, এযে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মত ভাস্‌চে; নীলাকাশের নির্ম্মল ললাটে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্‌ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করচে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা আপনি ভরে উঠ্‌ছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুম্‌কিও খসে নি; আজও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌চে, বল দেখি আমি তোমার জন্যে কি এনেছি! তবে জগতে জরা কোথায়? জরা

কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মত নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলচে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলি ফুটে ফুটে উঠ্‌চে। মৃত্যু কেবলি আপনাকেই আপনি ধ্বংস করচে—সে যা-কিছুকে সরাচ্চে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেল্‌চে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনি তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ কর, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মত মিলিয়ে যাক্‌; চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখ—শৈশবের সত্য দৃষ্টি ফিরে আসুক, জলস্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক্‌, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মত করে একবার দেখ,

সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ কর। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখ—কত বড় একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কি নিবিড়, কি নিগূঢ়, কি আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সঙ্গীতে বেজে উঠ্‌চে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে! এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন! এই সৌন্দর্য্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই—চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন—চির-সুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা—সংসারের সমস্ত পর্দ্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহঙ্কারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে

পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর—সত্য হোক্ তোমার জীবন, তোমার জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় হোক্, অমৃতময় হোক্!

দেখ, আজ দেখ, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই—কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলি কেটে কেটে যাচ্চে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মত আবৃত আবদ্ধ করতে পারচে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্ত মহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেদিগন্তে দীপ জ্বলচে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে—আজ তোমার কিসের সঙ্কোচ—আজ তুমি নিজেকে জান—সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠ, পুলকিত হয়ে ওঠ—তোমারি আত্মার এই মহোৎসব

সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মত এক ধারে পড়ে থেকোনা —যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মত উঞ্ছবৃত্তি কোরো না!

হে অন্তরতর, আমাকে বড় করে জানবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘুচিয়ে দাও—তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও! আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য; আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্ম্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও! আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধূলায় নত করে দাও যে ধূলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব

বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্ব্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনই যেতে দেবেনা—ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আস্‌তেই হবে, বারম্বার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে! দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধূলা জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়—অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হাল্কা হয়, ধূলার চিহ্ন থাকে না,—একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতে গিয়ে পৌঁছতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও —তখন কোনো ব্যবধান রাখনা,—তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের

পথে আবার পাঠিয়ে দাও—নির্ম্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি,—মনে গর্ব্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্চি; কিন্তু প্রেমের টান ত ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব্ব নিয়ে ত আত্মার ক্ষুধা মেটে না—শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্ব্বলতা—তখন গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই—তখনি তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না—সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক্, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্ম্মের ঝঙ্কারে,—বাজতে বাজতে একেবারে নীরব

হয়ে যাক্, শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক্—পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক্—সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, জীবন মৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক্, অন্তর বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক্, ভূর্ভুবস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ, বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করচে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্য্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভাল বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়; তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্চে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কি, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মানুষ বল্‌তে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য

করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্র শাসনকে নিযুক্ত করচে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তাহলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন্ মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত; সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন্, ভোগী নন্, প্রতাপশালী নন্ তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্চে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে

তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জ্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে কিন্তু এই জন্যেই যে মানুষ বড় তা নয়—মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে; মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই—মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোট হোক্ বড় হোক্, উচ্চ হোক নীচ হোক্, শত্রু হোক্ মিত্র হোক্ সকলেই আমার আপন।

মানুষের যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্ব্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগ স্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে

বড় হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খৃষ্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি, তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষ ভাবে আগলাতে সাম্‌লাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে

ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব্ব হয়—সেই গর্ব্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলি বাড়িয়ে নিয়ে চল্‌তে চেষ্টা হয়,—এর আর সীমা নেই—আরো বড়, আরো বড়, আরো বেশি, আরো বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চল্‌তে থাকে, তার সর্ব্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলি স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গল্‌তে পারে না, সে আপনার বড়ত্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্ত স্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড় সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড় কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষ ভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন—ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্ত স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই

ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে এই ত আমাদের প্রতি উপদেশ।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা ? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নিও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই—ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মত পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করচে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়—নমোনমঃ

—তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার—সর্ব্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন যা কিছু ঊর্দ্ধে আছে অধোতে আছে দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে; যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চল্‌চ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্য্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্য্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্চে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কি ?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্ব্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অনুভব করচেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্চে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যো-পান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে' সমস্ত জগৎকে সর্ব্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য্য পৃথিবীকে টান্‌চে, তাঁরই অনুভূতির

মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্ব্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্ব্বানুভূ—যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্ব্বানুভূ।

তাহলেই দেখা যাচ্চে যদি সেই সর্ব্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্চে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটচে। তার কাব্যদর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলচে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড় হয়ে উঠ্‌চে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ

যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্য্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্য্যন্তই সে সত্য, সেই পর্য্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ, সর্ব্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চ্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্ব্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড় পাওয়ার মূল্য কি? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই—আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সঙ্কেত আছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ কর, ভোগ কর—মা গৃধঃ, লোভ কোরোনা।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনা বর্জ্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বল্চে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এই সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উল্টো।

যে লোক আপনাকেই বড় করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয় ত নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম বলে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহঙ্কার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে—তখনই সে বড় হতে সুরু করে। কিন্তু সেই বড় হবার মূল্যটি কি? নিজের

প্রবৃত্তিকে বাসনাকে, অহঙ্কারকে খর্ব্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না;—গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে স্বাদেশিক হবার জন্যে মানুষকে শিশুকাল থেকে কি সাধনাই না করতে হয়। তার যে সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড় করে' পরকে আঘাত করে তাকে কেবলি খর্ব্ব কর্ত্তে হয়—তার যে সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চ্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ একদিকে যতই বড় হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়—ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ

ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়—একেই ত বলে বীতরাগ হওয়া। এই জন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, বলে, মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড় করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্চে মনুষ্যত্বের চেষ্টা।—আমরা আজ দেখ্‌তে পাচ্চি পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌঁচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্চে, বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতা-বোধকে য়ুরোপ যেমন

পরম মঙ্গল বলে মনে করচে এবং সে জন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্চে সাত্ত্বিকতার অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্ম্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্ম্মের চর্চ্চা করা—অন্নজল নদী পর্ব্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা; ধর্ম্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা মনের মধ্যে

বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড় তার চৈতন্যও তত বড় হওয়া চাই, এই জন্যই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্ব্বত্রই এমনতর সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মত স্পষ্ট বলেই'ত জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই এই অনন্তকে সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করেনি।

এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই

কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারি সাধনা প্রচার করবার জন্যে এদেশে মহাপুরুষেরা জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি—এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোট করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড় রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে;—জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোট বড় আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে—এখানে মানুষের সঙ্গে

মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেননি।—তাঁকে হারানো মানেই হচ্চে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই,যা ভালো তা কেবলি বাধা পায়, পদেপদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্ব্বত্র ছড়াতে পায়না—সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না—দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলি পদ্মপত্রে

শিশির বিন্দুর মত টলমল করতে থাকে; তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে; তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করচে—যে বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করচে—দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুল্‌চে এবং মানব-ঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্ম্মাণ করচে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোট হয়ে গেল, ভরসা রইল

না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলি তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলি টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলি ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই। যে মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, নচেৎ ইহ অবেদীৎ

মহতী বিনষ্টি :—ইহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জান্‌তে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য —প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্ব্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই, যে পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এই জন্য সকল দেশেই সর্ব্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করচে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজ্‌চে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্চে, কেননা সেই একই অমৃত—সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট

হয়ে মূর্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতি-কারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করচে কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে—একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা প্রশস্ত করে নিয়েছে, সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনো তারা ব্যাপ্ত হচ্চে, তাদের শক্তি এখনো কোথাও তেমন করে অভিহত হয়নি—তারা চলেছে তারা বদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই জন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কি? তারা মনে করচে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম—এর পরে বুঝি আর কিছু নেই—যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে

মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট্ দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করচে—আজকালকার দিনে উন্নতি বল্‌তে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে—এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্‌সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্ব্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী এই জন্যে তিনিই হচ্চেন সর্ব্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা,

বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্ব্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড় সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক্ থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে—আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলি আঘাত পেতে থাক্‌ব,—কেবলি অপমান কেবলি ব্যর্থতা ঘট্‌তে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা

করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌বে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠ্‌বে যিনি "সর্ব্বগতঃ শিবঃ," যিনি "সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ" যিনি "সর্ব্বানুভূঃ।" তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখ্‌লে আমাদের উন্নতি হবেনা তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল—যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠ্‌বে না, তাহলে আমি বল্‌ব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতা-স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্—সমস্ত উদ্ধত

সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বল্‌তে হবে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। প্রবলরা দুর্ব্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বল্‌তে হবে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ যিনি এক, অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই,—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু,— তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্ব্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারত-

বর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কি আশ্চর্য্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়—মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্চে—মনে হয় যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতার মূর্ত্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে,

লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখ্‌তে পাননি—মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি—এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, যস্যছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ—এইজন্যে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যুঃপ্রাণ স্তক্মা—প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্তু আয়তে, নমো অস্তু পরায়তে—যে প্রাণ আস্‌চ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্চ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তাও প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আস্‌বে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না।

সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রই তুমি—যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্চে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্চে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি সেই জন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন—প্রাণো বিরাট্—সেই প্রাণকেই তাঁরা সূর্য্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে—যে প্রাণ ক্রন্দন করচ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জ্জন করচ সেই তোমাকে নমস্কার—নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিদ্যুতে জলে উঠ্চ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়চ সেই তোমাকে নমস্কার—প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতর অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে

তোমায় যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন— তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে—সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে হে সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দ তোমাকে সর্ব্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক্—যাক্ সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক্—দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক্—সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক্, শত্রুমিত্র মিলে যাক্,

স্বদেশ বিদেশ এক হোক্! হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিদ্র নই—তোমার অমৃতময় অনুভূতির দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক্ তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্য্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা ত কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেননি। কোন্ প্রেমের সুগন্ধ বসন্ত বাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্ত্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি—বলেছেন রসো বৈ সঃ—সেই জন্যই জগৎজুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম,—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানিভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্চি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নেজলে, ফুলেফলে, দেহেমনে, অন্তরেবাহিরে, বিচিত্র করে ভোগ করচি। হে অনির্ব্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখ্‌লে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নীচে নত হয়ে পড়ে, বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধূলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও—দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও, চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারো চেয়ে কিছুমাত্র বড় হতে;—তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়—রাজ-ভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্য্যে আপনাকে আর ধরে রাখ্‌তে পারচে না, চারদিকে ছড়াছড়ি যাচ্চে—

তোমার যে রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্চে না ফুরিয়ে যাচ্চে না—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায়মাতায়, স্বামীস্ত্রীতে, পুত্রেকন্যায়, বন্ধুবান্ধবে নানাদিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্চে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে অমৃত তারি একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও—তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি—যারা তোমারই সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরীব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুসি হয়ে যে জায়গাটিতে কারো লোভ নেই সেই খানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন